আশ্চর্য প্রদীপ?

যশোধরা রায়চৌধুরী

গোলাপ (সিভিল সোসাইটি) যে নামে ডাকো

সুশীল সমাজের আন্দোলনের অভিমুখ নিয়ে এখন কল্পনা এবং জল্পনার অন্ত নেই। সুশীল সমাজ কথাটা এলো সিভিল সোসাইটির এক বিতর্কিত বঙ্গীকরণে। অন্য বাংলাটিও কম বিতর্কযোগ্য নয় : নাগরিক সমাজ। অর্থাৎ, গ্রামের মানুষ সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত নন?

তবে, সুশীল শব্দটি যে তার থেকেও বেশি বিভ্রান্ত করেছে আমাদের, কোনো সন্দেহ নেই। পড়ে নেওয়া যাক আনন্দবাজারে গত ৪ ডিসেম্বরে অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

'আমরা তো জানি, সুশীল বালক সাত চড়ে রা কাড়ে না, সেকারণেই সে সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব।' অতএব যেন 'সুশীল সমাজের প্রতিবাদ নিয়েই আমাদের মনে একটা সন্দেহ আছে।' 'কিন্তু অনির্বাণ বাবুরাম সাপুড়ের 'করেনাকো ফোঁসফাঁস' ধরনের এক সুশীলতার ধারণা এখানে বদ্ধমূল রেখেই আবার বলেছেন, তার সততা আর শান্ততার সাথে প্রতিবাদের কোন দ্বন্দ্ব বা কনট্রাডিকশন তো নেইই, বরং সৎ বলেই সে শান্ত থাকতেও পারে, আর শান্তভাবে কথা বললেই সে কথার মান্যতা তৈরি হয়।

সুশীল শব্দটিকে এত অনভিপ্রেত ইনুয়েন্ডো বা ব্যঞ্জনার মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে যদি ভাবতে শুরু করি সোজাসাপটা ভাবে তার ইংরেজিটা অর্থ বা সংজ্ঞা নিয়ে, তাহলে কেমন হয়?

একটি জনপ্রিয় এনসাইক্লোপিডিয়া বলছে:

Civil society is composed ot the totality of voluntary civie and social organizations and institutions that form the basis of a functionng society as opposed to the force-backed structures of a state (regardless of that state's political system) and commercial institutions.

অ্যাডাম ফার্গুসনকে যদিও এই শব্দচয়ের উদগাতা বলে মনে করা হয়, তবে এর শিকড় খুঁজতে গেলে মিলবে হেগেলের রাজনৈতিক দর্শন। সমাজের মাইক্রোকমিউনিটি বা ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী ব্যক্তি আর মাক্রোকমিউনিটি বা বৃহত্তর গোষ্ঠী রাষ্ট্রের মধ্যেকার ডায়ালেকটিক সম্পর্কের একটা স্তর হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন এই সিভিল সোসাইটিকে। পরে এই সংজ্ঞা আবার দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, একদিকে কার্ল মার্কসীয় তত্ত্বে আসে 'বুর্জোয়া সমাজের' ধারণা, আর অন্যদিকে আ-মার্কসীয়রা সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত করেন সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের লোকজনকে, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত কর্মে নিয়োজিত।

লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের সেন্টার ফর সিভিল সোসাইটির নির্মিত সংজ্ঞাটা দেখা যাক :

Civil society refers to the arena of uncoerced collective action around shared interests, purposes and values. In theory, its institutional forms are distinct from those of the state, family and market, though in practice, the borndaries between state, civil society, family and market are often complex, blurred and negotiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces, actors and institutional forms, varying in their degree of formality, autonomy and power. Civil societies are often populated by organisations such as registered charities, development non-governmental organisations, community groups, women's organisations, faith-based organisations, professional associations, trade unions, sele-help groups, social movements,business associations, coalitions and advocacy groups.

তবে এখানে আমাদের ভেতরে প্রশ্নের অবকাশ তৈরি হয়, কারণ, কেবলমাত্র কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী নয়, সুশীল সমাজের পরিধি আরো বহুধাবিস্তৃত বলেই ওই সংজ্ঞা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবং তাঁদের কাজ বা প্রতিবাদের ধরনও আরো অনেকটাই বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত। এবার দেখা যাক গত একবছরের কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে ঠিক কী কী ঘটেছে।

নন্দীগ্রাম রিজওয়ানুর তসলিমা

উপরোক্ত তিনটি ঘটনা, সে বিষয়ে তথাকথিত বঙ্গীয় সুশীল সমাজের ভূমিকা, তা নিয়ে নানা মহলে নানা প্রতিক্রিয়া, এবং মিডিয়ার ভূমিকা : এই সব নিয়ে কোনো পুনরুচ্চারণের কারণ দেখি না। সবটাই সবার জানা ধরে নিয়েই আমাদের বক্তব্যের অবতারণা।

২০০৭ -এর গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে চলা ঘটনার পটভূমিতে পশ্চিমবাংলার সুশীল সমাজ যেন বাংলার নৈতিক আত্মা। সেটা খুব কম কথা নয়। বিবেকের ভূমিকা বাঙালির চিরদিনের পছন্দ। যাত্রাপালা থেকে শুরু করে নানা কাহিনিতেই এই ভূমিকা সে প্রিয় চরিত্রদের দিয়ে এসেছে। তাই, আজকের সুশীল সমাজের নৈতিক ভূমিকা যে তার প্রতিবাদের বিষয়ীভূত সরকারকে, ক্ষমতাসীন অ্যাবসল্যুট পাওয়ারের দম্ভশীল দলকে, এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীকে বিপদে ফেলবে, ব্যাকফুটে ঠেলে দেবে এবং নরম গরম প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে তা স্বাভাবিক। তাই নানা জনসভায় সুশীল সমাজকে নিয়েও ব্যঙ্গবিদ্রুপ, ছড়া কাটা। অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, ভোট হারাবার থেকেও মন হারাবার ভয়।

সুশীল সমাজ যেন বাংলার মন।

এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। আশাবাদীদের কাছে এই প্রতিবাদ তার বহুস্বর স্বতঃস্ফূর্ততার জন্যই গভীরভাবে অনুপ্রেরণাজনক। কিন্তু এরপরেও একটা কিন্তু থাকছে।

এখানে আমার যেটা প্রশ্ন সেটা খুব সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করি। সুশীল সমাজকে সুশীল রাখার পেছনে কি কোন না কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয়না? রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে সুশীল সমাজের আন্দোলনের মুখ যে মুহূর্তে ফিরে যাবে, সে মুহূর্ত থেকেই গেল গেল রব তুলবেন কেউ কেউ, এমনটাই ভয়। আসলে, সুশীল সমাজ যতদিন সুশীল থাকবে, মানে যতদিন তাকে সুশীল করে রাখা যাবে, রাষ্ট্র শক্তির কিন্তু ততদিনই লাভ। আসলে সমাজের এই বিপুল অংশকে রাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যই যেন মিডিয়া এবং সুশীল সমাজ নিজে এই ব্যবস্থাপনাকে মাথা পেতে নিয়েছে। সে অরাজনৈতিক এবং সুশীল। সে গাড়ি পোড়ায় না, সে ইঁট ছোঁড়ে না, দোকান লুট করে না। সে কোনো নেতার প্রতি ব্যক্তিগত বিষোদ্গার করে না। সে কোন ক্ষমতার বিরুদ্ধে পাল্টা ক্ষমতাদখলের আহ্বান জানায় না।

ক্ষমতাদখল : আসলে যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের এটিই সর্বপ্রথম কথা। সেদিকে সুশীল সমাজের অনেকেই সোচ্চার বা নীরবে এই কথা জানাচ্ছে, যে 'যে যায় লঙ্কায় সেই হব রাবণ।' তার মানে কি এইটে দাঁড়ায় না, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নির্বাচন এবং দলীয় রাজনীতির প্রতি আস্থা নেই তাঁদের? তাঁরা কি তবে নৈরাজ্যবাদী?

এক্ষেত্রে না ওঠার বিপদ দুমুখী। এক, যেহেতু প্রতিবাদটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যথা ভোট, রাজনীতি, পার্টি পলিটিকস ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন, সেহেতু এর গুরুত্ব হ্রাস। দুধুভাতু করে একে রেখে দেওয়ার সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি প্রেস করফারেন্স, আমরা ওঁদের বোঝাচ্ছি, ওরা নিশ্চয় বুঝবেন, এবং আমাদের কাছে ফিরে আসবেন, জাতীয় ছেলে ভোলানো কথা। অন্যথায় সহজেই একে 'মাওবাদী' জাতীয় তকমায় ঠেলে দেওয়া, কেননা ভোটভিত্তিক রাজনীতিতে সিভিল সোসাইটির যেমন বিশ্বাস নেই, যেমন মাওবাদীরও নেই।

দেখা যাক আগে কী ঘটেছিল

ভারতের বা বাংলায় তো সিভিল সোসাইটির প্রত্যক্ষ ভূমিকা, সংগঠনমূলক, সৃজনমূলক ভূমিকা আমরা দেখেছিলাম ঊনবিংশ শতকেই। সংস্কারচিন্তায়, রিফর্ম মুভমেন্টের শরিকরা ছিলেন নবগঠিত রাষ্ট্র এবং মূক জনসাধারণের মাঝখানে সেতু হয়ে। নগরকেন্দ্রিক, ইংরেজি শিক্ষিত একটা বড় গোষ্ঠী এই গোটা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিলেও, কেন্দ্র - পরিধির খেলায় পরিধিস্থ, বাংলার গ্রামীণ সমাজও বারে বারে এমনতর ক্রিয়াকাণ্ডের উদগাতা হয়ে উঠেছে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দুর্ভিক্ষের সময়ে বরিশালে অশ্বিনী দত্তের চালানো লঙ্গরখানা। যা তাঁর ভক্ত ছাত্রদের মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। এমন উদাহরণ খুব বেশি না হলেও খুঁজলে মিলবে। এই সামাজিক ভূমিকায় তখন শিক্ষক উকিল ডাক্তাররা, প্লেগের সময়ে রাস্তায় নেমে পরিষ্করণের কাজ, রোগীর সেবা, জনকল্যাণমূলক নানা ক্রিয়াকর্ম ? উদারহণ ভুরি ভুরি। ধীরে ধীরে যা রাজনৈতিক মাত্রা পেতে শুরু করবে।

তবে মূলত ব্যাপারটা নগরকেন্দ্রিক। খবরের কাগজে প্রতিবাদী চিঠিপত্র লেখা বা নিজেরা কাগজ বার করার সেইসব হজুগের কথাও মনে পড়বে, এলিট কংগ্রেসিদের 'আবেদন- নিবেদনে'র পাশাপাশি এইসব 'অ্যাকটিভিটি' চারুলতার স্বামী ভূপতির মতন অনেক শিক্ষিত সফল পুরুষকেই আকৃষ্ট করেছে নিঃসন্দেহে।

রাজনৈতিক বৃত্তটা সম্পূর্ণ করবেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। যা ছিল এধরনের সিভিল মুভমেন্ট, তাকে যেন যাদুবলে 'মাস মুভমেন্টে' রূপান্তরিত করার সুবিশাল বিপ্লব ঘটালেন তিনি এক দশকের মধ্যে। ১৯১৪ থেকে ১৯২০, রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হল নখদন্তহীন সুশীল সমাজ : সত্যাগ্রহ আর অহিংস আন্দোলনের দীক্ষা গোটা ছবিটাকেই পাল্টে দিল। তখন উঠে এল নতুন ডিনামিনেটর, রাজনীতির নতুন এক অস্তিত্ব, অনুঘটক, নির্ধারক যার নাম 'মাস', পিপল বা জনগণ। গত নব্বই বছরে জনগণ শব্দটির কোনো বিকল্প পাওয়া যায়নি আমাদের রাজনৈতিক ভাষা বিশ্বে। স্বাধীনতার আগে আন্দোলনকারীদের বাচনে জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র বৈধ ভাগীদার, একমাত্র দাবিদার, এবং স্বাধীনতাপরবর্তী গণতন্ত্রে তার প্রতিনিধিদের দ্বারাই রাষ্ট্রযন্ত্র চলবে, স্বাধীনতাপরবর্তীতে এইই হয়ে উঠল বিকল্পহীন একমাত্র পথ।

এই সব ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তু। আমার মত অধমজনের আলোচ্য নয়। প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণেই যে সেই জনগন বা 'সর্বসাধারণ' (=সর্বহারা?) -এর ঐতিহ্য বহন করেই চলেছে আজকের পশ্চিমবঙ্গের জনগণতান্ত্রিক বহুদলীয় রাজনৈতিক কাঠামো। এ যাবৎ আমরা কেবলি শুনে আসছিলাম, জনগণ কী চায়, জনগণ কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বোঝে কিনা। জনগণই ছিল পার্টি ও পাওয়ার স্ট্রাকচারের কাছে শেষ আশ্রয়, জনগণের দোহাই দিয়েই শিল্পায়নের পরিকল্পনা, জনগণের মুখ চেয়েই কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণের স্বপ্নজাল রচনা।

এই গোটা ডায়ালগে কোথাও সিভিল সোসাইটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, বরং এমনটা মনে হচ্ছিল, জনগণের সাথে ক্ষমতাসীন পার্টির এত ভালো কম্যুনিকেশন আছে এমনিতেই, যে কোনো তৃতীয় পক্ষের নাক গলানো সেখানে কাবাব মে হাড্ডির মত বেমানান।

ধারণাটা ভেঙে গেল সিঙ্গুরে, ডিসেম্বর ২০০৬-এ। জনগণের পুলিশ যখন শিল্পায়নের দোহাই দিয়েই জনগণের মাথা ফাটায়, অকথ্য গালি দিতে দিতে লাঠি হাতে তেড়ে যায় যুবা, বৃদ্ধা, নারী ও শিশুদের দিকে, তখন বোঝাই যায় রাষ্ট্র আর জনগণের মধ্যে কোথাও একটা প্রচণ্ড কম্যুনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছে। সেতুহীনতার মুখটা আরো খুলে যায় নন্দীগ্রামে, যেখানে শাসক দলের সক্রিয় সদস্যরা, সমর্থকরা হাতে টাঙ্গি তুলে নেয় জমি অধিগ্রহণের তুঘলকি নোটিশের প্রতিরোধে।

কম্যুনিকেশন ব্রেকডাউন এতটাই চিহ্নিত হয়, যে শারীরিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে তবে রাস্তা কাটা হয়, সেতু ভাঙা হয়। যেন জনগণ একটা রাস্তা চেয়ে পায় না, একটা সেতু পেতে কয়েক দশকের 'আন্দোলন' লাগে, তাদের হঠাৎ কী হল যে তারা সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিল বহির্বিশ্বের সাথে? এরপর কম্যুনিকেশনহীনতাটাকেই আরও বেশি করে লাল কলিতে দাগিয়ে দেওয়া হয়, যখন জনগণের পার্টির নেতারা জনগণের এই প্রতিবাদকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়ে বলে দেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম বহিরাগতদের চক্রান্ত। এখানে বাবা ও সন্তানদের তুলনাটা অব্যর্থ হয়ে ওঠে। নিজের সন্তানের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বাবা যেন দোষারোগ করেছেন পাশের বাড়ির লোককে, সন্তানকে বখিয়ে দেওয়ার জন্য।

এবার যে জনগণ প্রতিরোধ করেছে, তাদের চরিত্রটা দেখা যাক। মূলত মুসলিম ও হিন্দু নিম্নবর্ণীয় এই গোষ্ঠীটি কিন্তু প্রকৃত অর্থেই নিম্ন বর্গীয়, এবং কৃষিজীবী। সর্বতো অর্থেই তো এরা সর্বহারা জনগণের তকমার শ্রেষ্ঠ ক্যানডিডেট! তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাটা যখন একেবারে সামনে এসে যায়, তখন জনগণের পার্টিও আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না, তাদের হাত রক্তাক্ত হয়ে যায়।

এরপর রিজওয়ানুর কাণ্ড। মিডিয়ার তৎপরতায় এখানেও সামনে আসে, নিম্নমধ্যবিত্তের বিপরীতে উচ্চবিত্ত এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশের নেক্সাস বা অশুভ আঁতাতের প্রকট চিত্রটা। একে মাইনরিটি তায় খেটে খাওয়া মানুষ...যার জীবনের সংরক্ষণের কোন দায়ই নিতে পারেনি নাগরিক পুলিশ, উল্টে তাকে ঠেলে দিয়েছে আত্মহত্যার দিকে, নাকি সজ্ঞানে মদত দিয়েছে হত্যায় (এই প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে যাবে হয়ত)?

সেতু রচনার ভার

অতএব, ফাঁক যে আছে রাষ্ট্র আর জনগণের মধ্যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে কোথাও একটা ভোটার আর ভোট দিয়ে যাওয়া

'জনপ্রতিনিধি'দের মধ্যে যোগাযোগহীনতা তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ফাঁকটাতেই তো সেতু রচনার ভারটা নিতে হল সিভিল সোসাইটিকে। বুদ্ধিজীবী নামক খায় না মাথায় মাখে গোত্রীয় শ্রেণীটিকে আমরা বিশেষ না ঘাঁটিয়েও বলতে পারি, সেতু রচনার কাজ করতে পারে শিক্ষিত যে কোন গোষ্ঠী : আইনজীবী, অধ্যাপক, ডাক্তার অথবা কেরানি। অরাজনৈতিক যে কোন ফোরাম এই দায়িত্ব নিতে পারে, এবং নিয়েওছেন। মেডিকাল ক্যাম্প করে পীড়িতদের চিকিৎসা করে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যপরিষেবার ফাঁকটা পূরণ করার কাজটা মার্চ ২০০৭ থেকে নন্দীগ্রামে করে আসছেন ডাক্তাররা। আইনজীবিদের একটা বিরাট অংশ নানা ইস্যুতে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন -এর হাতিয়ার নিয়ে ন্যায়যুদ্ধ চালাচ্ছেন। সম্ভাবনা অনেক। রাইট টু ইনফর্মেশনের আওতায় তথ্য যাওয়া, কাজে প্রবন্ধ লেখা, সভায় বক্তৃতা দেওয়া, পথসভা করা, গণ পিটিশন দেওয়া, মোমবাতি হাতে হাঁটা, নীরব ধিক্কার মিছিলে সামিল হওয়া অথবা এস এম এসে তথ্য প্রচার করা। মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যমের ভূমিকাটা তো বহু চর্চিত, এবং খানিকটা দ্বিধাদীর্ণও বটে। সেটা আর একটা প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে।

কতদিন অরাজনৈতিক থাকবে ?

এখন প্রশ্ন একটাই : আর ঠিক কতদিন অরাজনৈতিক থাকবে এই প্রতিবাদ? আর কতদিন আরাজনৈতিক রাখা যাবে। আপাতত অস্বস্তির কারণ হলেও ভবিষ্যতে রাষ্ট্র শক্তির পক্ষে ব্যাপারটা কতটা সুবিধার হয়ে উঠবে, যদি অরাজনৈতিক থেকে যায় এই প্রতিবাদ?

পশ্চিমবঙ্গে একটা আশ্চর্য অবস্থা আছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। tina বা there is no alternative। যতই প্রতিবাদ হোক, সুশীল সমাজ তথা জনগণের একাংশের মনে এখনো এটাই বাস্তব যে বামফ্রন্টের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের বোধহয় তাই সহজেই গিলিয়ে দেওয়া যায়, নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিকল্প হিসেবে উন্নততর (পড়ুন শিল্পায়িত) বামফ্রন্টের স্লোগানটাই। অর্থাৎ বিকল্প নেই, বিকল্প হয় না।

অন্যদিকে, লেফট বা বাম শব্দটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে প্রতিবাদ ঐতিহ্য। জমি আন্দোলন, তেভাগা, অথবা কেন্দ্র - রাজ্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলির সবই ঐতিহ্যগতভাবে ওই সর্বাতিশায়ী বামফ্রন্টের তথ্য বাম পার্টিগুলোর কুক্ষিগত, সব প্রতিবাদ, সব আন্দোলনেরই যেন ইজারা নিয়ে নিয়েছে এখনকার এই রাষ্ট্রক্ষমতাভোগী বাম দল। তাই তার বাইরে আর কোনো প্রতিবাদের স্পেস বা পরিসর তৈরি হয়না। ৩০ - ৪০ বছরের এই ধারাবাহিকতা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার মধ্যে এক অযাচিত বিস্ময় ও রূঢ়তা আছে কোথায়। যেখানে বামকে ধিক্কার দেয় পথে নেমে বাম যুদ্ধিজীবীরাই, সেখানে একটা বিমূঢ়তার সৃষ্টি হবেই। আবার এই বাম বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদের হাতিয়ারও যখন হয়ে ওঠে ত্রিশ বছরের পুরনো সলিল চৌধুরীর গান, লোকসঙ্গীত গণসঙ্গীত বা রবি ঠাকুরের 'এবার তোর মরা গাঙে...' তখন তো বেজায় অ্যানাক্রনিস্ট হয়ে ওঠে গোটা চিত্রটাই। পুরোনো মিছিল মিটিঙের গোটা ব্যাপারটাই 'জনগণের' তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গী চিল, এখন সেই আন্দোলন ক্ষমতাতন্ত্রের কেন্দ্র, তাই প্রতিবাদীরা এখানে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তারি ফেলে আসা অস্ত্র তুলে নিয়ে, তারি ছেড়ে যাওয়া খোলসে প্রাণ সঞ্চার করেন যেন।

গান্ধিবাদী অম্লান দত্ত এবং মার্কসবাদী সুমিত সরকারকে এক প্রতিবাদের প্ল্যাটফর্মে হাজির করাতে পেরেছে এই সুশীল সমাজই। অবার ৬০- ৭০ দশকের গণসঙ্গীতের হাংওভারের পাশেই সম্ভব হয়েছে নীরব মিছিলের গান্ধিবাদী প্রতিবাদভঙ্গি। কাজেই প্রতিবাদের ভাষা কেমন হবে সেটা কোনো মহল থেকেই আর ডিকটেট করে দেওয়া যাবে না।

প্রতিবাদের অভিমুখই বা যে ঠিক কী? এখানে বাম ক্ষমতাতন্ত্র, হিংস্রতার দখলনীতি সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, মানবাধিকার লঙ্ঘন? মাঝে মাঝেই ডিফিউজড, ধোয়াটে হয়ে যায় লক্ষ্যটাই। শিল্পায়নের নামে কৃষকের উৎখাতকে কখনো আমাদের প্রতিবাদের সূচীমুখে তুলে আনতে হয়, কখনো সেজ-এর কাঠামোয় শ্রমিকের অনিবার্য শোষণসম্ভাবনাকে। কোন ব্যাপারটা কখন উঠে আসবে জানা নেই। কিন্তু এটাও ঠিক যে কেউ আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলার দায়বদ্ধতা আসছে। আর, নিজেকে সৎ সুস্থ ও শান্ত নাগরিক হিসেবে পরিগণিত করার জন্যই এই মতামত তৈরির দায়টা আমাদের সবার।

আরো একটা মজা হল, প্রতিবাদের ঢল নামার সাথে সাথেই যেন ক্রমাগতই নতুন নতুন প্রতিবাদের বিষয়ও জুগিয়ে চলেছে এই ক্ষমতাতন্ত্র, তার হেজিমনিক সিস্টেম। কাঠামোর অন্তর্গত দুর্বলতাই হয়ত অনেক ক্ষেত্রে এই পচাগলা সমস্যার জায়গাগুলো বিস্ফার ও ফোঁড়ার মুখগুলো ফেটে পুঁজি বেরিয়ে আসবার মত অবকয়গুলোকে এক্সপোজ করার একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার। গত একবছরে যাবতীয় আন্দোলনের প্রতিবাদী পক্ষে আমরা দেখছি নারীর একটা বিশেষ নেতৃত্বের ভূমিকা, যা কেবলই কাকতালীয় নয় বোধ হয়। মহাশ্বেতা দেবী, মেধা পাটকার, অনুরাধা তরোয়াল, শাঁওলি মিত্র, অপর্ণা সেন, মীরাতুন নাহার, জয়া মিত্র, বোলান গঙ্গোপাধ্যায় : তালিকাটি এখানেই সীমায়িত নয়। যেখানে বাম ক্ষমতাতন্ত্রের পরিচিত মুখগুলিতেই এক বৃন্দা কারাত ছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে কোনো নারীমুখ নেই : এবং নেতৃবৃন্দ কথাও বলেন বেশ পুরুষালি ঢঙেই (দমদম দাওয়াই শব্দচয়ের মধ্যেও যে পুরুষতান্ত্রিক ভাষাবন্ধন লক্ষণীয়), অশ্লীলতার ধারা ঘেঁষেও কখনো কখনো চলে যায় যে সব কথা, সেখানে প্রতিবাদের নারীমুখ সিভিল সোসাইটিতেই শুধু নয়, নন্দীগ্রামের শাঁখ বাজিয়ে মিছিলে চলা মানুষের ভেতরেও উজ্জ্বল উপস্থিতি জানায়। এখানে ১৭ জুলাই ০৭ আনন্দবাজারে প্রকাশিত অশ্রুকুমার শিকদারের নিবন্ধটির বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও। মিছিলের সামনের দিকে নারীদের রেখে পেছনে লুকিয়ে থাকার কথা বলে কাপুরুষতার দায় যারা ১৪ মার্চের নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ কমিটির উপরে চাপিয়েছিলেন, তাঁদের উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন অশ্রুকুমার, বাম আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মেয়েদের অগ্রণী ভূমিকার উদাহরণ তুলে।

অর্থাৎ, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কর্মসূচি এই মুহূর্তে না থাকলেও এ বহুস্বর, নানা মানুষে ছড়ানো, আপাতকেন্দ্রীয়তাহীন প্রতিবাদটি যে দানা বাঁধতে বাঁধতে ক্রমশ এক গণ আন্দোলনের চেহারা নেবে না তা এখনো বলা যায় না। আমরা আশায় থাকছি। আন্দোলনে ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মে গতি পায় কিনা, দেখার। tina যতই সত্য হোক, শেষ সত্য কী?

টিনার সমস্যাটা গ্লোবাল না লোকাল?

আবার, একটু বড় প্রেক্ষিত থেকে দেখলে, tina-র সমস্যাটা আর মোটেই স্থায়ী সমস্যা নয়। বামফ্রন্টকেই যেমন শিল্পায়নের অ্যাজেন্ডাটি গিলতে হবে, এবং সেটা তার মনঃপূত না হলেও 'উন্নতত'র তাকে হতেই হবে, অর্থাৎ ধরে নিতে পারি এখানেও দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ, বৃহৎ পুঁজির জালে ধরা দেওয়া ছাড়া।

অর্থাৎ টিনা আসলে রাজনৈতিক সামাজিক নয়, বরং অর্থনৈতিক সমস্যা বলেই ভয় হয়। এটা গ্লোবাল সমস্যা, বিশ্বায়নের সমস্যা।

কোনো বিশ্বায়িত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, এমন শক্তি বা প্ল্যাটফর্ম সিভিল সোসাইটির আছে কি? সে কি যথেষ্ট ইকুইপড বা সক্ষম, ওই গ্রান্ড ডিসকোর্সটির সাথে তর্কে নামতে? যেহেতু রাজনৈতিকভাবে সত্যিই আর কোন অলটারনেটিভ স্পেস নেই। রাষ্ট্র ক্ষমতা যাঁর হাতেই থাক, বাজপেয়ী মনোমোহন বা বুদ্ধদেব, মুক্ত বাজারের হাওয়াতেই যে তরীটি বাইতে হবে তাকে, এই বিষয়ে দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ বলেই তো আপাতত মনে হচ্ছে। অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে। প্রতিবাদীকে কোন স্পেস সত্যিই দেয় কি এই গ্লোবাল অ্যাজেন্ডা? আসলে মিডিয়াকে তো মিডিয়ার মত করেই পুঁজির খেলাটা খেলতে হয়। তাই সে সিভিল সোসাইটিকে 'অরাজনৈতিক' বানিয়ে তার সহজতম একটা স্থান বা নিশে রচনা করল। তাকে একটা খোপে বসিয়ে দিল। কোন্ রাষ্ট্রীয় শক্তি বা রাষ্ট্রীয় দল আছে যে এই অ্যাজেন্ডার সাথে সরকারি সংঘাতে যাবে? তাই জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদগুলো, ভয় হয়, আরো আরো রক্তক্ষয়ী হতে থাকবে। এবং শেষমেশ বিভ্রান্ত সিভিল সোসাইটি নিজেও 'শিল্পায়নের পক্ষে' হাত তুলতে বাধ্য হবে না তো?

অন্যদিকে এটাও তো আমরা দেখেছি যে সারা বিশ্বে কী বিশাল প্রতিবাদ ঘটছে বিশ্বায়ন আর WTO কথিত free exchange-এর বিরুদ্ধে। দেশে দেশে WTO-র সভার বাইরে বিশাল ডেমনস্ট্রেশনের কথা মনে করে দেখি আমরা। অথবা ওয়ালমার্ট বা আরো কোন কোন বড় গোষ্ঠীর হাতে ছোট পুঁজির বিনাশের আশংকায় একজোট হওয়া দোকানদারের কথা ভাবি।

শেষমেশ লড়াইটা যে তাই সেই গ্রান্ড ডিসকোর্স, সেই বিশ্বায়িত পুঁজিকাঠামোর সাথেই, এটা মনে রাখা ভাল। এবং এখানে কোন 'অরাজনৈতিক' নেই। এই প্রতিবাদও একটি রাজনৈতিক স্ট্যান্ড। সারা পৃথিবীতে বিশ্বায়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে 'অলটারনেটিভ গ্লোবাল' প্রতিবাদী নেটওয়াকিং চলেছে, যাঁরা অন্তত এই অপ্রতিরোধ্য, বিকল্পহীন বিশ্বায়নের রথচাকাকে একেবারে থামিয়ে না দিতে চেয়ে (সেটা অসম্ভব বলেই হয়ত) তার ভেতর থেকেই অন্তত কিছু ছাড় বা কনসেশন দাবি করছেন। কিছু অ্যানোম্যালি বা বৈষম্যের দূরীকরণ দাবি করছেন। সম্পূর্ণ উইন উইন সিচ্যুয়েশন না আদায় করতে পারলেও, চাইছেন শোষিতের দিক থেকেও বেনিফিট বা লাভ অন্তত যেন কিছুমাত্র থাকে। যেন মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়, যেন অন্তত সামাজিক - অর্থনৈতিক পচনগুলোকে World social forum ডিসকোর্সভুক্ত করা যায়। ডিরেগুলেশনের ভালোগুলোকে দেখেও, তার কনট্রোলহীন জলতরঙ্গ যাতে নিজের বেগে মানুষকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে না যেতে পারে, তাই ছোট ইন্টারেস্ট গ্রুপ থেকে বাজারের মুক্ততার বেগটাকে কমিয়ে দেয় এইসব প্রতিবাদ। প্রতিবাদের ফলে নেহাত অমানবিক, নেহাত অন্যায় কিছু আইনকানুন, কিছু নীতি পাল্টাতে বাধ্য হয় মাল্টিন্যাশনালরা, রষ্ট্রের প্রধানরা। একটি দুটি রেগুলেটর বসাতে রাজি হয় নিমরাজি হলেও। ক্ষয়ক্ষতি, যা অনিবার্য, তার ভয়াবহতাও একটু কমে আসে হয়ত এর ফলে।

এটুকুই আশা আমাদের। নর্থ সাউথ ডায়ালগ থাকবে যেমন, উন্নত দেশগুলির অনুন্নত দেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়া নিজের মর্জিমাফিক ন্যায্য প্রতিবাদও থাকবে। ক্ষমতা থাকবে, প্রতিবাদ থাকবে। প্রতিবাদহীন ক্ষমতা বড় বীভৎস জিনিস।

ধনতন্ত্র আছে বলেই, গণতন্ত্রকেও থাকতে হবে।

(এই লেখ টি তৈরি করার আগে পরিকথা সম্পাদক শ্রী দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, এবং সহমর্মী অধ্যাপক তৃণাঞ্জন চক্রবর্তীর সাথে পৃথক দুটি আলোচনা থেকে আমি অনেকগুলি চিন্তাসূত্র পেয়েছি, আমার কাজ ছিল সব সূত্রগুলিকে একটা লেখার ভেতরে নিয়ে আসা মাত্র)

তথ্যসূত্র

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় : 'নাগরিক সমাজ'ই বেশ সুশীল হওয়াও কিন্তু জরুরি, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ ডিসেম্বর, ২০০৭

অশ্রুকুমার শিকদার : দেলাক্রোয়ার মহান ছবিটি মনে পড়বেই, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জুলাই ২০০৭

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী, অভিজিৎ কুণ্ডু : The Coming of the secular in Indian Polity ` A sociological reading, south Asia Research, Vol 27 (3), November 2007

wikipedia.com